Meghnadbadh Kavya : Path O Paryalochana
Edited by Barun Kumar Chakraborty

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০১৯

প্রকাশক :
নারায়ণচন্দ্র ঘোষ
অক্ষর প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
৯৮৭৪৮৪৩৮৬৭

প্রচ্ছদ :
গৌতম নন্দী

বর্ণগ্রন্থন :
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন, কলকাতা- ১২

মুদ্রক :
বসু মুদ্রণ, কলকাতা -৪

ISBN : 978-93-83161-07-2

৪০০ টাকা

সূচিপত্র

মহাকাব্যের কবি মধুসূদন ❐ শ্রীলেখা বসু ৯

মেঘনাদবধ কাব্য : সমকালীন কিছু দৃষ্টিকোণ ❐ সুমিতা চক্রবর্তী ১৫

রবীন্দ্রনাথ : মধুসূদন ও মেঘনাদবধ কাব্য ❐ বিশ্বনাথ রায় ৩১

মেঘনাদবধ কাব্য : দুই রবীন্দ্রনাথ ❐ দেব আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৬

'মেঘনাদবধ কাব্য' : বিখ্যাত ব্যক্তিদের চোখে ❐ বরুণ সীট ৬১

আখ্যান তত্ত্ব ও মেঘনাদবধ কাব্য ❐ শুভাশিস চট্টোপাধ্যায় ৭৫

প্রাচ্যধারার সাহিত্য ও মেঘনাদবধ কাব্য ❐ সোমদত্তা ঘোষ ৮৫

মেঘনাদবধ কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ❐ সীমা মুখোপাধ্যায় ৯৫

মেঘনাদবধ— রাম কাহিনীর রাবণায়ন ❐ সৌমেন দাশ ১০৪

মেঘনাদবধ কাব্যের নাট্যভাবনা ❐ শম্পা ভট্টাচার্য ১১৩

রসের বহুমাত্রিকতা : মেঘনাদবধ কাব্য ❐ জয়ন্ত বিশ্বাস ১১৭

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা ও কবি-ভাষা ❐ অলোক রায় ১৩০

মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা বৈশিষ্ট্য ❐ রবীন্দ্রকুমার দত্ত ১৪১

সকলই ফুরালো স্বপন প্রায়!... ❐ শুক্লা দত্ত ১৪৮

প্রসঙ্গ অমিত্রাক্ষর ছন্দ : মেঘনাদবধ কাব্য ❐ সঞ্জয় প্রামাণিক ১৭৩

মেঘনাদবধ কাব্যে অলংকার ব্যবহার ❐ প্রণতি সিন্‌হা ১৭৯

মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা ❐ পবিত্রকুমার মিস্ত্রী ১৮৭

মেঘনাদবধ কাব্যে বাঙালিয়ানা ❐ বরুণকুমার চক্রবর্তী ১৯৮

মহাকাব্য মেঘনাদবধ : লোকসংস্কৃতির নিরিখে ❐ হাবিবুর রহমান/ জাহাঙ্গীর হোসেন ২০৪

মেঘনাদবধ কাব্যের কবিত্ব ❐ সুকুমার মিত্র ২১১

মেঘনাদবধ কাব্য : আলোচনা –পর্যালোচনার ইতিবৃত্ত ❐ অনন্যা ঘোষ/ জয়ন্তকুমার সিনহা মহাপাত্র ২১৭

মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতির ভূমিকা

পবিত্রকুমার মিস্ত্রী

সাহিত্যের দুটি উপাদান — মানুষ ও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও মানুষের টানাপোড়েনেই সাহিত্যরূপ বস্ত্রখণ্ড নির্মিত হয়। সাহিত্য সৃজনে কেউ প্রকৃতিপ্রেমী কেউ বা মানবতাবাদী। যে কবি বা লেখকের যে দিকে ঝোঁক, তাঁকে আমরা সেইমতো আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু শুধু প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে বা শুধু মানুষকে কেন্দ্র করে সাহিত্য সার্থক রূপ লাভ করতে পারে না। দুয়ের সার্বিক মিশ্রণে সাহিত্য, সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। যেমন বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক', সেখানে প্রকৃতি বন্দনা, কিন্তু মানুষ কী বাদ গেছে। মানুষও আছে, কারণ প্রকৃতিকে দেখবে তো মানুষ, আস্বাদন করবে তো মানুষ, বর্ণনা করবে তো মানুষই।

মেঘনাদ বধ কাব্যটি মূলত যুদ্ধ বিষয়ক কাব্য। কাব্যের মূল রস হল — বীর রস। যুদ্ধের মধ্যে প্রকৃতিকে আনা খুব কঠিন কাজ। কিন্তু মধুসূদনের প্রকৃতিপ্রেম নিয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। কারণ তিনি চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে কপোতাক্ষ নদ, বটবৃক্ষ, সায়ংকালের তারা প্রভৃতিতে বারবারই প্রকৃতির কথা বলেছেন, প্রকৃতি বন্দনা করেছেন। কবিমাত্রই কম-বেশি প্রকৃতি প্রেমিক। মেঘনাদ বধ কাব্যে প্রকৃতির কথা বলার অবকাশ কম, কিন্তু মধুসূদন অবকাশ তৈরি করে নিয়েছেন। শুধু যুদ্ধের বিবরণ নয়, যুদ্ধের মাঝখানেও ফাঁকে ফাঁকে যেখানে সুযোগ পেয়েছেন প্রকৃতির বর্ণনা দিয়েছেন। এবং সেই বর্ণনাগুলি দেওয়ার ফলে যুদ্ধের মতো নীরস, বস্তুতান্ত্রিক বিষয়ও আমাদের কাছে অনেকখানি আস্বাদনযোগ্য হয়ে উঠেছে। এখানে মধুসূদনের প্রকৃতিপ্রেম নিয়ে খুব বেশি আমাদের আলোচনার অবকাশ নেই। কারণ যে বিষয়টি তিনি নির্বাচন করেছেন সেই বিষয়ের প্রেক্ষিতেই সেই অবকাশটি তিনি রাখেননি। কিন্তু প্রকৃতির প্রতি তাঁর অনুরাগ বা অনুরক্তি — এমনই যে তার মধ্যেই প্রকৃতিকে তিনি এনেছেন। কতটুকু প্রকৃতিকে এনেছেন তার সন্ধানই আমাদের মূল লক্ষ্য।

সাহিত্য দর্পণ গ্রন্থের রচয়িতা বিশ্বনাথ কবিরাজ মহাকাব্য রচনার যে আবশ্যিক বিষয়গুলির কথা উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যে একটি হল সকাল ও সন্ধ্যার বর্ণনা। এটি মহাকাব্য দাবি করে। মেঘনাদ বধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গ শুরু হচ্ছে সন্ধ্যার বর্ণনা দিয়ে —

অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধূলি,
একটি রতন ভালে। — ফুটিলা কুমুদী;
মুদিলা সরসে আঁখি বিরস বদনা
নলিনী; কূজনি পাখী পশিল কুলায়ে,

গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা'রবে।
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি,
শর্ব্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,

প্রথম সর্গে রাবণের বীরপুত্র বীরবাহু ও মহাবলী কুম্ভকর্ণ রামচন্দ্রের হাতে নিহত হয়েছেন। এই খবর রাবণ ও ইন্দ্রজিতের কানে পৌঁছেছে। ইন্দ্রজিৎ প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এভাবে দিন সমাপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় সর্গের শুরুতেই সন্ধ্যার বর্ণনা। এ যেন ইঙ্গিতবহ, রাক্ষসবংশের উপর অন্ধকার নেমে আসতে চলেছে। গোধূলি আকাশে উজ্জ্বল সন্ধ্যাতারার মতো রাক্ষস বংশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র ইন্দ্রজিৎ শুধু অবশিষ্ট আছে। প্রথম সর্গে রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধে রাক্ষস বংশের মূল যোদ্ধাদের পাশাপাশি বহু সৈন্যও নিহত হয়েছে। সন্ধ্যার শান্ত স্নিগ্ধ অন্ধকার রাক্ষসকুলকে কিছুটা হলেও স্বস্তি দিয়েছে। সন্ধ্যার বর্ণনায় তেমনই শান্ত মনোরম রূপ আমরা দেখতে পাই।

রুষ্ট ইন্দ্রজিৎকে নিধন করার জন্য ইন্দ্রপত্নী শচী, দুর্গার শরণাপন্ন হয়েছেন। দুর্গার মাধ্যমে শিবকে বুঝিয়ে কাজ হাসিল করতে হবে। এদিকে মহাদেব দুর্গমতম স্থানে ধ্যানে মগ্ন। যোগীশ্রেষ্ঠ শিবের যোগ সাধনার পক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ —

যোগাসন নামে শৃঙ্গ, মহা ভয়ঙ্কর,
ঘন ঘনাবৃত, তথা বসেন বিরলে
যোগীন্দ্র।...

দুর্গা এইস্থানে মদনকে নিয়ে হাজির হয়ে শিবের ধ্যানভঙ্গ করেছেন। নির্জন নিরালায় স্ত্রীকে পেয়ে শিব প্রেমামোদে মত্ত হয়েছেন। প্রকৃতি যেন মিলনের সার্থক পটভূমি রচনা করেছে —

ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল, মকরন্দ-লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া,
বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে...
.....
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে।

মহাদেব পার্বতীকে পশুর চামড়া নির্মিত আসনে বসানোর সঙ্গে সঙ্গেই প্রকৃতি রাজ্যে মিলনের উপযুক্ত সুন্দর বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। চারিদিকে ফুল প্রস্ফুটিত হয়েছে, মধুলোভী মৌমাছিরা ফুলের কাছে ধেয়ে এসেছে। কোকিলের কুহুতান ধ্বনিত হয়েছে, শিশির সিক্ত ফুলরাজি গিরিশৃঙ্গকে আচ্ছাদিত করেছে।

দ্বিতীয় সর্গের শেষদিকে, দেবরাজ ইন্দ্রের নির্দেশে পবনদেব যে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করেছেন তাতে স্বর্ণ লঙ্কার সমূহ বিনাশের ইঙ্গিতটি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে —

হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙে আচম্বিতে,
জাঙাল! কাঁপিল মহী, গর্জ্জিল জলধি।
তুঙ্গ-শৃঙ্গ ধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ুসঙ্গে রণরঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত; হাসিল
ক্ষণপ্রভা, কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি।
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি
রাশি রাশি, বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে, মহাঝড় বহিল আকাশে;

দেবরাজ ইন্দ্রের অনুচর চিত্ররথ ইন্দ্রপ্রদত্ত অস্ত্র লক্ষ্মণকে দিতে এসেছেন। এই অস্ত্র দ্বারাই লক্ষ্মণ মেঘনাদকে নিধন করবে। লঙ্কার আকাশে ঘন কালো মেঘ, কিছু পরে লঙ্কাবাসীর জীবনে নেমে আসবে। যে অস্ত্র দ্বারা লঙ্কার শ্রেষ্ঠ বীর নিহত হবে, সেই অস্ত্র প্রদানের জন্য যথোচিত প্রলয়ঙ্কর প্রাকৃতিক পরিবেশ মধুকবি রচনা করেছেন। প্রবল ঝড়ে বৃক্ষ উপড়ে পড়া আসলে প্রতীকী। রাম-লক্ষ্মণের হাতে বৃত্রের মতো মহা শক্তিশালী রাক্ষসদের পতনের ইঙ্গিতবাহী। রাঘবদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়ার পর চিত্ররথ ফিরে গেছেন, তখন প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ কবি এঁকেছেন—

থামিল তুমুল ঝড়; শান্তিলা জলধি;
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ,

কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হলে মানুষের মনে যেমন নিশ্চিন্ত একটি ভাব বিরাজ করে, প্রকৃতির মধ্যে তেমনি শান্ত, স্নিগ্ধ রূপ আমরা লক্ষ্য করলাম। রামচন্দ্র অস্ত্র পাওয়ার অর্থ ইন্দ্রজিতের নিহত হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা। রামচন্দ্রের শিবিরের পাশাপাশি প্রকৃতি রাজ্যেও যেন তার একটা আগাম ছোঁওয়া লেগে গেছে। তাছাড়া চারদিক সমুদ্র বেষ্টিত লঙ্কার যে ভৌগোলিক অবস্থান তাতে প্রকৃতির এমন দোলাচলতা স্বাভাবিক, কখনো প্রলয়ঙ্করী রূপ কখনও স্নিগ্ধ। তৃতীয় সর্গে স্বামী সন্নিধানে যাওয়ার জন্য ইন্দ্রজিৎ পত্নী প্রমীলার যে রণরঙ্গিনী মূর্তি আমরা দেখতে পাই তাকে ফুটিয়ে তুলতে সার্থক প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দিয়েছেন মহাকবি। —

যথা বায়ুসখা সহ দাবানল — গতি
দুর্ব্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে।
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি;
ঘন ঘনাকারে রেণু উড়িল চৌদিকে; —
.....
.... বিহঙ্গম কাঁপিল কুলায়ে,
পর্ব্বত-গহ্বরে সিংহ; বনহস্তী বনে;
ডুবিল অতল জলে জলচর যত!

ইন্দ্রজিৎ পত্নী প্রমীলা বীরাঙ্গনা। তাঁর সগর্ব হুঙ্কার রাম-লক্ষ্মণের প্রতি — তিনি রাক্ষসবংশের কুলবধূ, রাবণের বৌমা, বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিতের স্ত্রী। রাম-লক্ষ্মণকে নিধন করে দ্রুত ফিরে আসার কথা বলেও তাঁর স্বামীও ফিরছে না দেখে তিনি একরকম যুদ্ধযাত্রায় বেরিয়েছেন। তাঁর বীরদর্পকে সার্থকভাবে পরিস্ফুট করতে প্রকৃতির এমন ভয়ঙ্কর রূপ যথার্থ।

'অশোকবন', নামক চতুর্থ সর্গে অশোকবনে বন্দিনী সীতার মনোবেদনা সার্থকভাবে ফুটে উঠেছে প্রকৃতির সাহচর্যে। সীতার দুঃখে প্রকৃতিও যেন কাতর, তার রঙ রূপ রস সবই বিগত হয়েছে —

স্বনিছে পবন; দূরে রহিয়া রহিয়া
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে যেন তরু, তাপি মনস্তাপে
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিনী,
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি চলিছে সাগরে,
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ কাহিনী!

ইন্দ্রজিৎ প্রস্তুত হচ্ছেন। আগামীকাল যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে পরাস্ত করে মেরে ফেলবে— এই গান রাক্ষসপুরের মায়াবিনী গেয়ে বেড়াচ্ছে। এই খবর শুনে সীতা অত্যন্ত শোকাকুলা জনকনন্দিনীর বেদনাকে বোঝানোর জন্য প্রকৃতির এমন ভূমিকা এককথায় অনবদ্য। কোনও মানুষের দ্বারা এর থেকে সার্থকভাবে বোঝানো যেত কী? না। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের এমন হৃদ্যতার সম্পর্ক সাহিত্যে আমরা অনেকক্ষেত্রেই পেয়েছি। কালিদাসের অভিজ্ঞানম শকুন্তলম্ নাটকে শকুন্তলার বিরহে বনের পশুপাখি লতাপাতার বেদনার্ত রূপের কথা আমরা জানি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সুভা' গল্পে সুভার নীরবতার, একাকিত্বের সার্থক উদাহরণ হয়ে উঠেছে প্রকৃতি ও মনুষ্যেতর প্রাণী। এক্ষেত্রেও দেখলাম সীতার বিরহে পাখি নীরব, গাছেরা যেন তাদের ফুলের সাজ খুলে মাটিতে ফেলেছে মনোকষ্টে। নদী কাঁদতে কাঁদতে সাগরের কাছে এই দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করতে চলেছে।

বিভীষণ পত্নী সরমার কাছে সীতা নিজের দুঃখের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে রাবণ কর্তৃক হরণ হওয়ার ঘটনার বর্ণনা করেছেন। ভীতসন্ত্রস্ত অসহায় সীতা প্রকৃতিকেই আপন বলে ভেবে নিয়েছিলেন। প্রাকৃতিক উপাদানের কাছেই নিজের দুর্দশা বর্ণনা করেছেন। তাদেরই বার্তাবহ রূপে নিযুক্ত করেছেন —

হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ,
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা
ঘোর রবে কহ যথা রঘু-চূড়া-মণি,
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজয়ী!
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি, দূত-পদে
বরিনু তোমায় আমি, যাও ত্বরা করি
যথায় ভ্রমেণ প্রভু! হে বারিদ, তুমি
ভীমনাদী ডাক নাথে গম্ভীর নিনাদে!

আকাশ, বাতাস, মেঘ প্রভৃতির মাধ্যমে সীতা রাম-লক্ষ্মণের কাছে তাঁর হরণ হওয়ার বার্তা দিতে চেয়েছেন। মানুষের সহায়ক রূপে প্রকৃতিকে ব্যবহারের কথা আমরা পাচ্ছি। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা পত্রকাব্যে 'দশরথের প্রতি কেকয়ী' নামক পত্রে কৈকেয়ী প্রাকৃতিক নানা উপাদানের সাহায্যেই তাঁর বক্তব্যকে প্রচার করবেন বলে জানিয়েছেন। এখানেও সীতা একই পদ্ধতি নিয়েছেন।

'উদ্যোগ' নামক পঞ্চম সর্গে লক্ষ্মণ দেবী চণ্ডীর পূজার জন্য লঙ্কার উত্তরদ্বারের চণ্ডীর দেউলে প্রবেশ করেন। দানব-দমনী দেবীকে তুষ্ট করে ইন্দ্রজিৎকে নিধনের জন্য প্রস্তুত হতে চান লক্ষ্মণ। নিশীথে একাকী লক্ষ্মণ মন্দিরে প্রবেশ করেন। তাঁর সাধনায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী মহামায়া দেখা দেন এবং লক্ষ্মণকে বর দেন। মহামায়ার আবির্ভাবের উপযুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ মধুকবি রচনা করেছেন এভাবে —

.... গরজিলা দূরে
মেঘ; বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাঁপিয়া
সহসা! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে,
কানন, দেউল, সর ঃ থর থর থরে!

সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যটিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রকৃতির রুদ্র রাগের পরিচয় আমরা লক্ষ্য করি। কাব্যের প্রধান ঘটনা যেহেতু যুদ্ধকেন্দ্রিক সেহেতু প্রকৃতির এমন প্রলয়ঙ্কর রূপ মানানসই। দেবী চণ্ডীর দেউলে যাওয়ার সময়কাল হল রাত্রিবেলা, তার উপর গভীর বনের মাঝে মন্দির। দুর্গম স্থানে যাওয়ার পথে লক্ষ্মণকে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতারও সম্মুখীন হতে হয়েছে —

... সহসা মেঘ আবরিল চাঁদে
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহুঙ্কার স্বনে!
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে,
.....
কড় কড় কড়ে বজ্র পড়িল ভূতলে
মুহুর্মুহুঃ! বাহুবলে উপাড়িলা তরু
প্রভঞ্জন! দাবানল পশিল কাননে!
কাঁপিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি

লক্ষ্মণের বীরত্বের পরীক্ষা, সাহসিকতার পরীক্ষা লঙ্কার রাক্ষসের পাশাপাশি লঙ্কার ভয়ঙ্কর প্রকৃতিও বুঝি নিয়েছে। এমন দুর্যোগেও লক্ষ্মণের অচল অটল দৃঢ় মূর্তি দেখে ক্ষণকালের মধ্যেই প্রকৃতিরাজ্যে শান্ত ভাব ফিরে এসেছে। —

.... আচম্বিতে নিবিল দাবাগ্নি;
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ
তারাকান্ত; তারাদল শোভিল গগনে!
কুসুম-কুন্তলা মহী হাসিলা কৌতুকে।
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা।

প্রকৃতির এই শান্তশ্রীর অনতিকাল পরেই লক্ষ্মণ চণ্ডীর দেউল খুঁজে পেয়েছে। রুদ্ররূপের পাশাপাশি প্রকৃতির শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর রূপের চিত্রও মধুকবি সযত্নে অঙ্কিত করেছেন।

মহাকাব্যের শর্ত মেনে সন্ধ্যার বর্ণনা আমরা আগেই পেয়েছি। এবার সকালের পেলাম। পঞ্চম সর্গে চণ্ডীর দেউলে পূজা সমাপ্ত করার পর লক্ষ্মণ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাছে যেতে উদ্যত হয়েছেন, তখন রাত্রি শেষে প্রভাত হয়েছে —

..... কূজনিল জাগি
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা
মহোৎসবে পূরে দেশ মঙ্গল-নিক্কণে!
বৃষ্টিলা কুসুম-রাশি শূরবর-শিরে
তরুরাজি; সমীরণ বহিলা সুস্বনে।

আসলে চণ্ডীর পূজা সমাপ্ত করার অর্থ লঙ্কাজয়ের পথে একধাপ অগ্রসর হওয়া। অনিশ্চয়তার অন্ধকার কেটে দৈব বলে লঙ্কাজয়ের আলোর মুখ দেখা। নিশার অন্ধকারের শেষে সুপ্রভাতের বর্ণনা তারই সংকেতবহ। সকালের অনুরূপ বর্ণনা পাই ষষ্ঠ সর্গে। ইন্দ্রজিৎকে বধ করার জন্য রামের নির্দেশে লক্ষ্মণ বিভীষণের সঙ্গে গমনোদ্যত। তার পূর্ব মুহূর্তে মধুকবি সকালের বর্ণনা দিয়েছেন —

হাসি দেখা দিলা ঊষা উদয়-অচলে
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে,
দুঃখতমোবিনাশিনী! কূজনিল পাখী
নিকুঞ্জে, গুঞ্জরি অলি, ধাইল চৌদিকে
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শর্ব্বরী,
তারাদল লয়ে সঙ্গে; ঊষার ললাটে
শোভিল একটি তারা, শত তারা তেজে।
ফুটিল কুন্তলে ফুল, নব তারাবলী!

প্রভাতের এই যে সুন্দর মনোহর ছবি তা এই সর্গের শেষে রামচন্দ্রের শিবিরে বিরাজ করেছে। লক্ষ্মণের হাতে ইন্দ্রজিৎ নিহত হওয়ার পর রাক্ষসপুরে অন্ধকার নেমে এসেছে। প্রভাতের সবথেকে উজ্জ্বল তারা সূর্যের মতো লক্ষ্মণও রঘু বংশের উজ্জ্বল তারা হয়ে উঠেছেন।

বিভীষণের সহায়তায় লক্ষ্মণ লঙ্কার অন্তঃপুরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে স্বর্ণ লঙ্কার প্রকৃতিতে বিষাদের সুর জেগে উঠেছে। লঙ্কার শ্রেষ্ঠ বীরের ভাবী পতনের ইঙ্গিত যেন প্রকৃতিরাজ্যে আগে ধরা পড়েছে —

.... শুধাইল রম্ভাতরুরাজি;
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট, শুধিলা মেদিনী
বারি। ....
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
বনদল; বৃষ্টিচ্ছলে গগন কাঁদিলা;
কল্লোলিলা জলপতি, কাঁপিলা বসুধা,

পরবর্তীতে লক্ষ্মণের খড়্গাঘাতে ইন্দ্রজিতের পতনে প্রকৃতিতে এমনই প্রলয় সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবী কম্পিত হয়েছে, সমুদ্র উত্তাল হয়েছে। স্বর্গ, মর্ত, পাতালে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে —

ইন্দ্রজিৎ, খড়্গাঘাতে পড়িলা ভূতলে
শোণিতার্দ্র। থরথরি কাঁপিলা বসুধা;
গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে
সহসা পূরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে,
মর্ত্ত্যে, মরমর জীব প্রমাদ গণিলা
আতঙ্কে।...

ইন্দ্রজিতের মতো মহা শক্তিধর বীরের পতনের উপযুক্ত আবহ তৈরি করার জন্য প্রকৃতিতে এমন পরিবর্তন সাধন খুব স্বাভাবিক। বরং অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপের যে ব্যাপ্তি মেঘনাদের মৃত্যুর পর তা ততটা নয়।

ষষ্ঠ সর্গে মেঘনাদ নিহত হওয়ার পর সপ্তম সর্গের শুরুই হচ্ছে একটি নূতন দিন দিয়ে। প্রভাতের বর্ণনা দিয়ে মধুকবি সপ্তম সর্গ শুরু করেছেন। 'লঙ্কার পঙ্কজ রবি' মেঘনাদ সহ লঙ্কা এবং মেঘনাদহীন লঙ্কার মধ্যে যে বিস্তর ফারাক তা সহজে অনুমেয়। মেঘনাদহীন লঙ্কার সকালের যে ছবি কবি আঁকছেন তা এমন —

উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে,
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন,
উন্মীলি নয়ন পদ্ম সুপ্রসন্নভাবে,
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা
কুসুম কুন্তলা মহী, মুক্তমালা গলে।
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উথলে যেমতি
দেবালয়ে, উথলিল সুস্বরলহরী
নিকুঞ্জে। বিমল জলে শোভিনী নলিনী;

রাক্ষসদের বিরুদ্ধে রামলক্ষ্মণের জয়ের যে হাসি তা পৃথিবীর মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। পুব আকাশে এক নতুন সূর্য যেন নতুন দিনের সূচনা করছে। পুষ্পশোভিতা ধরিত্রী বিজয়মাল্য পরে উল্লসিত। লতাগৃহ থেকে সুমধুর ধ্বনি নির্গত হচ্ছে। অর্থাৎ চারিদিকে যেন আনন্দের হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে।

এই সপ্তম সর্গেই রাক্ষসরাজ রাবণ পুত্র হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য রণসাজে সজ্জিত হচ্ছেন। তাঁর সমস্ত সেনাবাহিনীকে রণসাজে সজ্জিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাক্ষস সৈন্যদের দাপাদাপির প্রভাব প্রকৃতির রাজ্যেও পড়েছে —

থর থর থরে মহী কাঁপিলা সঘনে;
কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি।
অধীর ভূধর বজ্র.....

রাক্ষসরাজ রাবণের রণ হুঙ্কারের পাশাপাশি রঘুসৈন্যরাও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তারা সমস্বরে 'জয় রাম' বলে বিকট চিৎকারে চারদিক কাঁপিয়ে তুলছে। রাক্ষস সৈন্যদের তুলনায় রঘু সৈন্যদের রণ হুঙ্কারের তীব্রতা অনেক বেশি তার প্রভাব প্রকৃতিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে —

মণ্ডিলা জীমূতবৃন্দ আবরি অম্বরে;
ইরম্মদে ধাঁধি বিশ্ব, গর্জ্জিল অশনি;
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল
সৌদামিনী,.....
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী
দিনমণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে

দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী, জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!

রাক্ষস বংশের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধারা রাম-লক্ষ্মণের হাতে পূর্বেই নিহত হয়েছেন। একমাত্র বীরযোদ্ধা রাক্ষসরাজ রাবণ জীবিত আছেন, সুতরাং রঘুদের তুলনায় রাক্ষসরা হীনবল হয়ে পড়েছে। তাই রাক্ষসদের রণসাজের সময় প্রকৃতির যে ভয়ার্ত রূপ তার তুলনায় রঘু সৈন্যদের রণসাজে প্রকৃতির ভয়ার্ত রূপের তীব্রতা ও ব্যাপ্তি অনেক বেশি। মহাকবি সচেতন ভাবেই এই পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন। এরপর যুদ্ধক্ষেত্রের উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। উভয়পক্ষ রণে মত্ত হয়েছে —

বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে।
অম্বুরাশি সম কম্বু ঘোষিল চৌদিকে
অযুত; টঙ্কারি ধনুঃ ধনুর্দ্ধর বলী
রোধিলা শ্রবণপথ!.....
.....
..... উড়িল চৌদিকে
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে
টলিলা কনকলঙ্কা; গর্জ্জিলা জলধি।

উভয়পক্ষের রণসজ্জায় চারদিকে যুদ্ধের আবহ তৈরি হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়েছে প্রকৃতিতে। যোদ্ধাদের ধনুকের টঙ্কারে অন্য কিছু শোনা যাচ্ছে না। স্বর্ণলঙ্কা কম্পমান, সমুদ্র গর্জন করছে। মধুকবি প্রকৃতিরাজ্যে বিশৃঙ্খলা বা ভয়াবহতা বোঝাতে বেশ কয়েকটি শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করেছেন যেমন, 'কাঁপিলা মহী' বা 'টলিলা লঙ্কা' প্রভৃতি। সমগ্র ভূমিভাগ নড়ে ওঠা অর্থাৎ চরম প্রাকৃতিক অস্থিরতা। যুদ্ধবিষয়ক কাব্যে মধু কবির এই বিশেষণ যে সার্থক তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'প্রেতপুরী' নামক অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর চিত্র সফলভাবে অঙ্কিত করেছেন মধুসূদন। প্রেতপুরীর যে বন তা সৌন্দর্যহীন, যেখানে পাখির কূজন নেই, ফুলের শোভাও নেই। —

..... নাহি ডাকে পাখী,
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে।
না ফোটে কুসুমাবলী — বনসুশোভিনী।
স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি প্রবেশিছে
রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য যথা।

যমালয়ের চিত্র সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলতে প্রকৃতি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

এই সর্গের অনেকটা অংশ জুড়ে নরকের বর্ণনা করতে গিয়ে নরকের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচয় দিয়েছেন মহাকবি। পিতার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রামচন্দ্র নরকে গেছেন। নরকের কুৎসিত কদাকার পরিবেশ রামের চোখ দিয়ে মধুসূদন দেখিয়েছেন —

দেখিলা তড়াগ বলী, সাগর-সদৃশ
অকূল; কোথায় ঝড়ে হুঙ্কারি উথলে
তরঙ্গ পর্ব্বতাকৃতি; কোথায় পচিছে
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে
ভীষণ মূরতি ভেক, চিৎকারি গম্ভীরে!
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষ শরীরী
শেষ যথা, হলাহল জ্বলে কোন স্থলে,

নরকের এমন বিকৃত,বীভৎস রূপ দেখে রামচন্দ্রের যে মনোকষ্ট তা অনতিবিলম্বেই দূর হয়, নরকের সুন্দর মোহময়ী রূপ দেখার পর।

সম্মুখ সমরে পড়ে যে সমস্ত বীরেরা মৃত্যুবরণ করেছেন তারা প্রেতপুরীতে গিয়েও চিরসুখ ভোগ করছে। প্রেতপুরীর এই চিরসুখের স্থলের প্রাকৃতিক পরিবেশ স্বাভাবিকভাবেই মনোরম হওয়া উচিত। তেমনই বর্ণনা আমরা দেখতে পাই —

..... চারিদিকে হেরিলা সুমতি
সবিস্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী
কনক-প্রসূন-পূর্ণ; — সুদীর্ঘ সরসী,
নবকুবলয় ধাম!

কোথাও বা রামচন্দ্র দেখতে পেলেন মনোরম বন, অমৃত বারিধারা নিয়ে নদী সদা কল কলরবে বয়ে যাচ্ছে। বনের মাঝে বীণা ধ্বনি ধ্বনিত হচ্ছে। বনের মধ্যে সর্বদা সুগন্ধযুক্ত বাতাস বইছে। জটায়ুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর রামচন্দ্র দেখলেন —

কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে
বৃক্ষচূড়, জটাচূড় যথা জটাধারী
কপর্দ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিনী বারি!
হীরা, মণি, মুক্তাফল ফলে স্বর জলে।
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে
শ্যামভূমি, তাহে সরঃ, খচিত কমলে!
নিরন্তর পিকরব কুহরিছে বনে।

চারিদিকে এত সৌন্দর্যে মণি, মুক্তা, কোকিলের কুহুতান — চিরবসন্তের মতো পরিবেশ বিরাজ করছে কিন্তু রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে বালী জানিয়েছেন জনমের

মতো সুখ মরণোত্তর এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে নেই। বেঁচে থাকার সুখ তুলনাহীন। কোনকিছুই তার তুল্য নয়।

মেঘনাদবধ কাব্যের মূল বিষয় যুদ্ধকেন্দ্রিক হলেও মধুসূদন দক্ষ শিল্পীর মতো প্রকৃতিকে কাব্যের মধ্যে ব্যবহার করেছেন। প্রকৃতির রুদ্র ও রমণীয় দুই রূপের পরিচয়ই আমরা পেয়েছি। বিষয়বস্তু অনুযায়ী রুদ্র রূপের উদাহরণ স্বাভাবিকভাবেই বেশি। যুদ্ধের পটভূমি তৈরিতে, কোনো ঘটনাকে সার্থক রূপ দিতে মিলনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে — নানানভাবে প্রকৃতি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। একটি বিষয়ে প্রকৃতি অনন্য ভূমিকা নিয়েছে, সেটি হল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট করা। যেমন সীতার সুমধুর কথা বলার ধরনের উপমায় কবি বলেছেন —

যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্বনে
ঝরে পূত বারিধারা, কহিলা জানকী,

এভাবে রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, রাম, লক্ষ্মণ প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রকে সার্থক রূপ দিতে বিশ্লেষণ করতে প্রাকৃতিক অনুষঙ্গের যথার্থ ব্যবহার করেছেন মধুসূদন। গাছপালা পশুপাখি প্রকৃতির সমস্ত উপকরণকে উপমা চয়নের ক্ষেত্রে নিপুণ শিল্পীর মতো ব্যবহার করেছেন মহাকবি।